ইতিহাসের দৃষ্টিতে
কৃষ্ণচরিত

অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ভূমিকা	১১-১৭
ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে কৃষ্ণকথা	১৮-৪১
মহাভারতে ও পাণিনি প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণকাহিনি	৪২-৯০
জ্ঞান যোগ	৯১-৯২
কর্ম-সন্ন্যাস যোগ	৯৩
অভ্যাস-যোগ	৯৪-৯৫
জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ	৯৬-৯৭
অক্ষর ব্রহ্ম যোগ	৯৮
রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ	৯৯-১০১
বিভূতি যোগ	১০২
বিশ্বরূপ দর্শন	১০৩-১০৪
ভক্তি-যোগ	১০৫-১০৬
ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগ	১০৭-১০৮
গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ	১০৯
পুরুষোত্তম যোগ	১১০-১১১
দৈবাসুর-সম্বাদ-বিভাগ-যোগ	১১২-১১৩
শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ	১১৪-১১৫
মোক্ষ-যোগ	১১৬-১৬৬
বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে কৃষ্ণকথা	১৬৭-১৮১
বিদেশি সাহিত্যে কৃষ্ণ-কথা	১৮২-১৮৫
প্রত্নতত্ত্বে-কৃষ্ণ-কথা	১৮৬-১৯৩
ভগবদ্‌গীতা ও কৃষ্ণ বাসুদেবের-কালনির্ণয়	১৯৪-২১০
উপসংহার	২১১-২৫২
উল্লিখিত বিষয়ের প্রমাণ-পঞ্জি	২৫৩-২৬২
নির্দেশিকা	২৬৩-২৬৪

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ভারতীয় জীবন-সাধনায় কৃষ্ণের স্থান সকলের ওপরে। হিন্দুর কাছে কৃষ্ণ শাশ্বত সত্য, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।[১] তিনি শ্যামসুন্দর, ভুবন-মনোহর, সচ্চিদানন্দ, প্রেমপ্রতাপঘন সর্বলোকমহেশ্বর। অতি প্রাচীন কাল থেকেই ইতিহাসের সকল অধ্যায়েই কৃষ্ণ-নাম, কৃষ্ণ-কথা পুণ্যতীর্থ ভারত-ভূমির সব হিন্দুর কাছে পরম পবিত্র, অমিত শক্তি ও অপার শান্তির অফুরন্ত উৎস। সেই পুরুষোত্তমের বিস্ময়কর জীবন-লীলা ভারতের নতুন পুরানো সকল ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, ও সুকুমার কলার বর্ণনীয় বিষয়। তাই ভারতীয় জীবন-সাধনায় কৃষ্ণ সত্যই বিশ্বরূপ। এজন্যে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পেতে হলে কৃষ্ণায়ণ কাব্যের বিশদ ও ব্যাপক আলোচনা অপরিহার্য।

কৃষ্ণ যেমন অসীম, তেমনি ভারতের নানা যুগের নানা ভাষায় রচিত কৃষ্ণায়ণ কাব্য-ও অনন্ত। সেই অশেষ শাস্ত্র-সাগর মন্থন করে কৃষ্ণ চরিতের পূর্ণাঙ্গ এবং বিচিত্র পরিচয় পাওয়া স্বল্পায়ু মানব-জীবনে একরকম অসম্ভব। তাই এ গ্রন্থে প্রধান ভাবে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, বেদ উপনিষৎ, মহাভারত, পুরাণ এবং অনুরূপ রচনা অনুসরণে ঐতিহাসিক বিচারক্রমে কৃষ্ণ কাহিনি এবং কৃষ্ণ-চরিতের কয়েকটি প্রধান দিক এবং সংশ্লিষ্ট ভারত-সাধনার স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক বিচার-প্রণালী গৃহীত হলেও এ লেখক কৃষ্ণের ভগবত্তায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। কিন্তু সে বিশ্বাস সর্বত্র যুক্তি ও বিচারের অবিরোধী। আর কৃষ্ণের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠা করাও এ রচনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ তা সুপ্রতিষ্ঠিত। লোককল্যাণের জন্যে যুগে যুগে ভগবানের আবির্ভাব হিন্দুচিন্তার মৌলিক সিদ্ধান্ত। প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণিত জীবন-কাহিনির ঐতিহাসিক আলোচনা এবং তার সঙ্গে ভারতের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির যথাশক্তি পরিচয় দেওয়া এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। পুরুষোত্তম কৃষ্ণের অলৌকিক লীলা-বিলাস যেমন রসিক ভক্তের একান্ত আস্বাদ্য, তেমনি লোক-কল্যাণ ও

---

১. নায়ং লোকাঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম—গীতা ৪।৩১

সমাজ-স্থিতির জন্যে মহাভারত-সূত্রধার কৃষ্ণের মৌলিক চিন্তা ও চেষ্টা সত্যপ্রেমী লোকের কাছে অতি আদরণীয়। লৌকিক দৃষ্টান্তেও কৃষ্ণ যে সমাজ-বিপ্লবের আদি সূত্রধার, রাষ্ট্র ও সমাজ সংহতির অগ্রনায়ক, তাও এ রচনার প্রতিপাদ্য। ভীষ্মের কথায় বলতে হয়, ভগবানের আবির্ভাব 'জগদ্ধিতায়।' সে হিত যেমন পারলৌকিক, তেমনি ইহলৌকিকও বটে। কৃষ্ণের মতে ইহলোক ও পরলোকের উন্নতি পরস্পর-সাপেক্ষ, নিরপেক্ষ নয়। 'যার ইহলোক নেই, তার পরলোক-ও নেই।'[১] গোপবেশ বেণুকর কৃষ্ণের রসলীলায় ভক্ত যেমন পরিতৃপ্ত, তেমনি পার্থসারথি কৃষ্ণের বিশ্বজনীন কল্যাণ আদর্শে জ্ঞানী ও কর্মী সমান ভাবে উদ্বুদ্ধ। কারণ সত্যের সমাদর সর্বত্র। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সম্পাদক দা হ্যামারশিল্ড্ (Dag Hammar Skjold) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত শান্তভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও নিষ্কাম কর্মাদর্শকে সর্বকালের এবং সর্বদর্শনের সার অভিজ্ঞতা বলে বিশ্বসভায় ঘোষণা করেছেন। এবং বিশ্বশান্তির জন্যে তা অপরিহার্য বলে বিশ্ববাসীকে তা অনুসরণ করতেও উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন—"ভগবদ্গীতা কোনো এক জায়গায় (২।৪৯?) সর্বকালের এবং সর্বদর্শনের অভিজ্ঞতা এই ক'টি কথায় প্রতিধ্বনিত করেছে : শান্তভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণমূলক নিষ্কাম কর্মের তুলনায় সকাম কর্ম অত্যন্ত হেয়। এটা সাংসারিক বিজ্ঞতার কথা। আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। এটা গভীর ধর্মবিশ্বাসের কথাও বটে। আমরা যদি সে বিশ্বাসকে আমাদের সকল প্রচেষ্টায় নিজস্ব রূপে বরণ করে নিই, তবে আমরা সুখী হব।" (The Bhagavad Gita echoes some-where an experience of all ages and all philosophies in these words : Work with anxiety about results is far inferior to work without such anxiety in clam self-surrender. These are words of worldly wisdom which we can all share. But they also express a deep faith. We will be happy, if we can make that faith ours in all our efforts) (২)। আজকের হিংসাজর্জর যুগে এই বিদেশি মনীষী কৃষ্ণকথার মধ্যে পার্থিব জীবন ও জগতের অনুকূল যে চিরন্তন কল্যাণ-আদর্শের সন্ধান পেয়ে বিমুগ্ধ—এ রচনায় সেই নিত্য-ধর্মের উপর যথাসম্ভব আলোকপাত করা হবে—তা আগে বলা হয়েছে।

জাগতিক জীবনের নিয়ম-স্থূলের চিন্তা মানবমনকে ক্রমশ সূক্ষ্মের দিকে টানে। সেরূপ বিষয়ী মানুষের মন কৃষ্ণের বিশ্বকল্যাণ কর্মের দিকে একবার আকৃষ্ট হলে, ক্রমে ক্রমে তা বিশুদ্ধ হয়ে সেই কর্ম-যজ্ঞের উৎস লোকোত্তর প্রতিভাধর কৃষ্ণের চিন্তায় স্থির হতে পারে। কৃষ্ণের কথায় বলা যায়—'কোনো মহৎ সাধনা ব্যর্থ হয় না।' এ আলোচনায় যদি সে মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তবে এই বই লেখার শ্রম সার্থক হবে—বলাই বাহুল্য।

---

১. নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি—গীতা ২।৪০

আলোচ্যমান উপাদান

এ রচনায় আলোচ্যমান উপাদান যে-সব আকর গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : (১) ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, (২) বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র, (৩) গ্রিক প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির বিবরণী, এবং (৪) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য বেদ, উপনিষদ, পাণিনি, পতঞ্জলি, অর্থশাস্ত্র, মহাভারত ও পুরাণ-সমূহ। এই উপাদানগুলির আনুমানিক কাল খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর থেকে খ্রিস্টীয় পাঁচশ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তী উপকরণগুলি ক্বচিৎ গৌণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা বিচারে এই অর্বাচীন উপাদানগুলির উপযোগিতা অতি অল্প। অবশ্য বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস আলোচনায় এগুলির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

কৃষ্ণ-সমস্যা

উনিশ শতকে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভারতবিদ্ মনীষীগণ ঐতিহাসিক গবেষণারীতি অনুসরণে কৃষ্ণ-চরিত আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ঐতিহাসিক পুরুষরূপে কৃষ্ণের অস্তিত্বে সন্দিহান। ফরাসি পণ্ডিত সোরেন সেন (Soren Sen) বুদ্ধের মতো কৃষ্ণকেও সূর্য-দেবতা বলতে দ্বিধা করেননি। অনেক মনীষী আবার কৃষ্ণের মধ্যে নানা উপাদানের সংমিশ্রণ-ও লক্ষ করেছেন। বড়োই কৌতুকের বিষয়—এই কৃষ্ণ-কাহিনির আলোচনায় নানা মুনির পরস্পর-বিরোধী নানা মত ব্যক্ত হয়েছে। এমন ভারত-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অল্পই আছেন যিনি কৃষ্ণ বিষয়ে কোনো না কোনো মত ব্যক্ত করেননি। ই.ডবলিউ. হপ্‌কিন্স (E. W. Hopkins) কৃষ্ণকে মহাভারতীয় নিষ্ঠুর হত্যালীলায় কপট কৌশল অবলম্বন করতে দেখে 'বকধার্মিক' (pious hypocrite) (৩) শঠ, প্রবঞ্চক বা চতুর-চূড়ামণি (sly, unscrupulous fellow) (৪) আখ্যায় নিন্দা করতেও কুণ্ঠিত হননি। আবার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ধর্মচ্ছলের ঘটনাবলি পরবর্তী যোজনা বা প্রক্ষেপ বলে গুরুত্ব দেননি এবং নীতি-ধর্মমূলক অংশগুলির ওপর জোর দিয়ে কৃষ্ণকে 'আদর্শ-পুরুষ'-রূপে ঘোষণা করেছেন। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র প্রথম সংস্করণে কৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ে বঙ্কিম যে মত ব্যক্ত করেন, দ্বিতীয় সংস্করণে তার কিছু কিছু পরিত্যাগ ও পরিবর্তন (৫) করতেও দ্বিধা করেননি। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মনীষীদের এসব মত-ভেদ, মত-পরিবর্তন, এবং মত-বিরোধের ফলে তথাকথিত 'কৃষ্ণ-সমস্যা'র (Krishna Problem-এর) উদ্ভব হয়েছে। এই সব বিভিন্ন মতের সমালোচনা করে এই কৃষ্ণ-সমস্যার সমাধান করা অতি দুরূহ ব্যাপার। কারণ এ বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধের অন্ত নেই। তবু এ রচনায় কৃষ্ণ সমস্যার প্রধান দিকের উপর আলোকপাত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র, ভাণ্ডারকর, হপকিন্স্, গার্বে, ভিন্টারনিজ্, হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, সুশীল কুমার দে, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষী আচার্যরা কৃষ্ণচরিত-বিষয়ে প্রচুর মূল্যবান কথা বলেছেন। এখানে তাঁদের প্রসিদ্ধ রচনা বা প্রবন্ধ থেকে আনা মতগুলির পুনর্বিচার করা হয়েছে। মতবিরোধ ঘটলে সপক্ষে বা বিপক্ষে যথাসম্ভব যুক্তি ও প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য বিষয়টি এতই ব্যাপক ও জটিল যে, এ বিষয়ে শেষ কথা বলা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, তা আগেই স্বীকার্য। তবে সত্যানুসন্ধানের জন্যে যুক্তিসম্মত আলোচনার অবসর সর্বদাই আছে ও থাকবে। কারণ মানুষমাত্রেরই ভ্রমপ্রমাদ হয়। তার মধ্যে দিয়েই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

কৃষ্ণকাহিনির উপর বৈদিক সাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম (২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মহাভারতীয় কাহিনিতে কৃষ্ণ যেখানে প্রতিপক্ষের যোদ্ধাকে বধ করতে অন্যায় বা কূট-কৌশল অবলম্বন করেছেন, সেসব অংশকে পূর্বসুরীরা কৃষ্ণকে হেয় করতে শৈব বা বৌদ্ধদের পরবর্তী যোজনা বা প্রক্ষেপ বলেছেন। কিন্তু এ বই-এ প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে, এসব ছলনাময় অংশের মূল বৈদিক সাহিত্যেই নিহিত, তা কৃষ্ণকে হেয় করতে শৈব বা বৌদ্ধদের কারসাজি নয়। ঋগ্‌বেদে দেখা যায়— ইন্দ্র বৃত্র প্রভৃতি দুর্ধর্ষ মায়াবী শত্রুদের মায়া বা কপট কৌশলেই বধ করেছেন। 'শঠে শাঠ্যাং' এটাই সর্বকালের যুদ্ধনীতি। কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বীর এবং মহাভারত ক্ষত্রিয়দেরই কাহিনি। কৃষ্ণ-কথা ভাবে ও ভাষায় বৈদিক আখ্যানের পূর্বাদর্শকেই অনুসরণ করেছে মাত্র। আগের প্রভাব পরের উপর পড়া স্বাভাবিক। এটা মহাভারতীয় কাহিনির প্রাচীনত্বের প্রমাণ। কালের পরিবর্তনে পুরাতনই রূপান্তরিত হয়ে নূতন বেশে দেখা দেয়। এ সত্য ভারতীয় মিশ্র ও জীবন্ত সুপ্রাচীন সভ্যতার প্রবহমান অন্তর্নিহিত ঐক্যেরই নিদর্শন। কৃষ্ণকথা তথা ভাগবত ধর্ম পূর্বতন বৈদিক ও অবৈদিক ধর্ম-সংস্কৃতি কীভাবে অঙ্গীকার ও ঐক্যবদ্ধ করে আবার পরিপূর্ণ ঝক্‌থ রূপে দান করেছে, তা বিস্ময়কর হলেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য। তা এ বইয়ের প্রতিপাদ্য।

প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করতে হলে সে-যুগের উপাদান বা উপকরণের ওপর নির্ভর করেই তা করতে হয়। ঐতিহাসিক কল্‌হনের কথায়, 'ভূতার্থকথনের' নাম ইতিহাস। ভূত শব্দের অর্থ (১) সত্য এবং (২) অতীত—দুই-ই। তাই অতীতের সত্য বিবরণ ইতিহাস। 'ইতিহাস' শব্দের অর্থও তাই। 'ইতি হ-আস'—অর্থাৎ 'যা এরূপ ছিল।' অতীত সত্যের নামে যদি স্বকপোলকল্পিত বিষয় বলা হয়, তবে তাকে ইতিহাস বলা যায় না। এ রচনায় মৌলিক উপাদানের উপর নির্ভর করে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাচীন মিশর, সুমের, গ্রিস ও রোমের আদি অধিবাসীরা আজ আর নেই। তাদের উন্নত ধর্মসংস্কৃতি-ও আজ আর জীবন্ত নয়। বাইরে থেকে আসা বিজয়ী বীররা ঐ সব

দেশ দখল করে সেখানে বাস করেছে। তাদের নিজেদের বিদেশি ধর্ম-সংস্কৃতি ঐ দেশের সুপ্রাচীন ধর্ম-সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করে আজ তার স্থানে রয়েছে। একমাত্র ভারতবর্ষেই এরূপ প্রলয়ংকর বিপর্যয় ঘটতে পারেনি। বর্বর আক্রমণকারীর নির্মম আঘাতকে প্রতিহত করে ভারত যুগে যুগে তার সমন্বয়ী প্রতিভার যাদুমন্ত্রে পরকে আপন করে নিয়েছে সত্য, কিন্তু আপনার বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দেয়নি। পরাক্রান্ত শক-হুন-কুষাণরা কণিষ্ক, হুবিষ্ক প্রভৃতি বিদেশি নাম ছেড়ে বাসুদেব প্রভৃতি ভারতীয় আর্য নাম ও ধর্ম নিয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়ে গিয়েছেন। উত্তর ভারতের সুসভ্য এবং সম্ভ্রান্ত গ্রিকরা ভারতীয় সভ্যতার উচ্চতর মানসিক সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় ভাগবত ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন এবং এই উদার ও উন্নত ধর্ম বিস্তারের জন্যে অজস্র অর্থব্যয়ে সুন্দর সুন্দর স্তম্ভাদি স্থাপন করে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে যবন-দূত হেলিওডোরস (Heliodorus) দ্বারা স্থাপিত বেসনগরের গরুড়স্তম্ভ এর বড়ো প্রমাণ। আধুনিক কালে জাতি সংঘের সাধারণ সম্পাদক জে. কে. হ্যামারশিল্ডের কৃষ্ণ-ভাবনার প্রতি যে স্বতঃফূর্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি আগে দেওয়া হয়েছে, তা অন্যতম দৃষ্টান্ত। তাই ভারতীয় সভ্যতার মৃত্যুঞ্জয় সত্তার ধ্রুব পরিচয় কৃষ্ণকথার মধ্যে আজও অম্লান রয়েছে বলা যায়।

বিবর্তনশীল মানবসভ্যতা ও একটি রেলগাড়ির অগ্রগতি ঠিক এক ধরনের নয়। গাড়ি যখন চলে, তখন তা পথের সব কিছু পিছনে ফেলে একাই এগিয়ে যায়, আর যাকে পথে তুলে নেয় তাকেও আর ধরে রাখে না, গন্তব্যস্থলে গেলে তাকেও নামিয়ে দেয়। কিন্তু একটি জীবন্ত মানবসভ্যতা তার যাত্রাপথের দুপাশে যা পায় তা তুলে নেয়। এভাবে পথের সঞ্চয়-ভারে তার ভাণ্ডার ভরে ফেঁপে ওঠে। এমনি করেই এক যুগের চিন্তা-চেষ্টা, ধর্ম-কর্ম, ভাব ও ভাষা সঞ্চিত ও রক্ষিত হয়ে সব লোকের সাধারণ সম্পদে পরিণত হয়। ফলে বিবর্তন ও বিবর্ধনের পথে মানব-সংস্কৃতির ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। এভাবে সমাজের অধস্তন পুরুষেরা পিতৃ পিতামহের সঞ্চিত ধনে ধনী হয় বলে তাদের কাছে তারা অশেষ ঋণে ঋণী হয়ে থাকে। সে ঋণ শোধ করার আর কোনো উপায় নেই। শুধু যে-নিধি পেলাম তাকে কেবল যক্ষের ধনের মতো রক্ষা করলেই চলবে না, তার অন্তর্গত সত্যকে উদ্ধার করে উত্তর পুরুষের হাতে সঁপে দিতে হবে। এভাবেই একটি জীবন্ত জাতির মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচিত্র ধারা নব নব সৃষ্টির পথে উত্তর পুরুষের মধ্য দিয়ে কালে কালে পরিপুষ্ট হয়ে এগিয়ে চলে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই নিত্য চলার বিচিত্র নিদর্শন। তাই কৃষ্ণ-কাহিনির মধ্যে যদি আগেকার বৈদিক দেবতাদের আখ্যান এবং মহেঞ্জোদারোয় আবিষ্কৃত মূর্তিগুলির কাহিনির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তবে তা বড়ো বিস্ময়ের ব্যাপার হলেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য।

ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতরা ভাগবত ধর্মের উৎপত্তি খুঁজতে গিয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রেম বা পুজার্থক ভক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখেছেন। কিন্তু ভক্তি-শব্দটি সম্ভবত

প্রেম-অর্থে ঋগ্‌বেদে (৮।২৭।১১) প্রথম পাওয়া যায়। লক্ষ করবার বিষয়—এ সূক্তটির ঋষি বৈবস্বত মনু। তিনিই গীতায় (৪।২-৪) যোগধর্মের প্রবক্তা। ভক্তি ও যোগ যে পরস্পর যুক্ত তা গীতায় (১৪।২৬) ভক্তি-যোগ শব্দের প্রয়োগেই প্রমাণিত। গীতা ভক্তিশাস্ত্র, ভাগবত ধর্মের আদি গ্রন্থ। তা যোগশাস্ত্ররূপে পরিচিত (গীতা ১৮।৭৫)। এছাড়া ঋগ্‌বেদে (১।১২৭।৫) অগ্নিদেবতার ভক্ত ও অ-ভক্তদের উল্লেখ আছে।

ক্ষত্রিয় কৃষ্ণ ও গোপ কৃষ্ণ

ঐতিহাসিক আর. জি. ভাণ্ডারকর বলেছেন, মহাভারতের ক্ষত্রিয় বীর কৃষ্ণ বহিরাগত খ্রিস্ট-উপাসক আভীর জাতির শ্লথ সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে রসিক গোপালকৃষ্ণে পরিণত হয়েছে এবং যিশুখ্রিস্টের শৈশব জীবনের অনুকরণে শিশু কৃষ্ণের অনেক কাহিনি চালু হয়েছে। তাঁর মতে, আভীররা খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বাইরে থেকে ভারতে এসেছিলেন। এ মত যে কাল্পনিক তা পরে বলা হবে। বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত গার্বে (Garbe) এবং তাঁকে অনুসরণ করে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন—মৌর্য-সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ভীত ব্রাহ্মণরা বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে ক্ষত্রিয় কৃষ্ণের অভেদ ঘোষণা করে কৃষ্ণোপাসক ভাগবতদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। সম্ভবত এ মত-ও যে কাল্পনিক তা দেখানো হবে। প্রচলিত মতে অবতারবাদের মূল ভগবদ্‌গীতায় আছে, কিন্তু দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো হবে—ঋগ্‌বেদেই অবতারবাদের মূল রয়েছে।

এ রচনায় গীতার উল্লেখের কাল নির্ণয়ে নূতন আলোকপাত করা হয়েছে। প্রচলিত মতে, মহাকবি কালিদাসই প্রাচীনতম গ্রন্থকার যিনি তাঁর কাব্যে গীতার কোনো কোনো শ্লোকের পুনরুক্তি করেছেন। কিন্তু দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো হবে মহাকবি অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে'র স্থানে স্থানে গীতার নানা শ্লোকের অনুকরণ আছে। এটা যে অবোধপূর্ব নয়, তা বলাই বাহুল্য। তাহলে গীতার উল্লেখের অধস্তন কাল-সীমা অশ্বঘোষের সময় অর্থাৎ খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী বলা যায়। তার নিচে নামানো যায় না।

পালি ভাষায় রচিত প্রাচীনতম বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্যতম অম্বট্‌ঠসূত্তে কৃষ্ণের জন্ম ও জীবনী সংক্ষেপে উল্লিখিত হযেছে। এতে কৃষ্ণকে ঋষি ও অলৌকিক শক্তিশালী ব্যক্তিরূপে পরিচিত করে বুদ্ধদেবের মুখ দিয়ে তাঁকে 'পিশাচ' বলা হয়েছে। ভাগবত ধর্মের প্রতি বৌদ্ধদের বিদ্বেষের অন্যতম দৃষ্টান্তরূপে এটা গ্রহণ করা যেতে পারে। কৃষ্ণকে ঋষি বলায় তিনি ভাগবত ধর্মের প্রবক্তা এ ইঙ্গিতটুকু এতে রয়েছে বলে মনে হয়।

এ বইয়ের সব জায়গায় কৃষ্ণ-চরিত্র আলোচনায় ঐতিহাসিক বিচার-প্রণালী অনুসৃত

হওয়ায় কৃষ্ণকে কোথাও আদর্শ-মানব বা বকধার্মিক বলা হয়নি। কারণ বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুমাদপি কোমল লোকোত্তর চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয় বড়োই দুষ্কর। তাই কৃষ্ণের অসাধারণ মহত্তম অবদান স্মরণ করলে তাঁকে "যথার্থ-মানব প্রতিনিধি" বা "পুরুষোত্তম" বলাই সঙ্গত মনে হয়। ভারতীয় সভ্যতার অনেক উচ্চতম আদর্শ কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। তাই রাজা ভোজবর্মণের ভাষায় কৃষ্ণকে "মহাভারত-সূত্রধার" বললে অত্যুক্তি করা হবে না। মহাভারত মহান্ ভারতেরই প্রতিচ্ছবি, কারণ মহাকাব্য জীবনের রস-রূপ।

কৃষ্ণকে "যথার্থ মানব-প্রতিনিধি" বা "পুরুষোত্তম" বলার আরও একটি নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। এখানে কৃষ্ণ-চরিত শুধু একটি লোকোত্তর মহাজীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনারূপে আলোচিত হয়নি। যে ভারত-পুরুষ নানা জাতি, নানা ধর্ম-সংস্কৃতি সমন্বয়ে প্রাগ্‌বৈদিক যুগে জন্মলাভ করে "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর" পথে মনুষ্যত্বের চরমোৎকর্ষ প্রকাশের জন্যে যুগে যুগে এগিয়ে চলেছে, তার অঙ্গরূপেও কৃষ্ণ-কথা আলোচিত হয়েছে। এ কাহিনির মধ্যে ব্যক্তি ও জাতি, সীমা ও অসীম, যুগ ও যুগাতীত এক রাখীবন্ধনে আবদ্ধ। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না—বর্তমান যুগে দেশবিদেশে কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গীতার প্রভাব ক্রমবর্ধমান। গীতার নিষ্কাম ত্যাগাদর্শ যেমন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন দেশবাসীর চিত্ত আপোষহীন সংগ্রামের পথে উদ্বুদ্ধ ও জয়যুক্ত করেছে, তেমনি গীতার নিষ্কাম কর্মাদর্শ বিশ্বের চিন্তানায়কগণকে লোককল্যাণে অনুপ্রাণিত করছে। তাই কৃষ্ণ অন্বর্থনামা "পুরুষোত্তম", "যথার্থ মহাভারত-সূত্রধার"। এই মহাসূত্রধারের মহাজীবন-সূত্রে যদি বৈদিক-অবৈদিক লোকযান (culture) বাঁধা পড়ে তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই সাংস্কৃতিক ঐক্য যে সমন্বয়মূলক ভারতীয় সভ্যতার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের অন্যতম নিদর্শন, তাও এ গ্রন্থে দেখানো হয়েছে।

পৌরাণিক কৃষ্ণ-কাহিনির মধ্যে যে আদিরসের আধিক্য দেখা যায়, তার মূল আছে বেদে। তা যথাস্থানে দেখানো হবে।